প্রথম অধ্যায়

মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সৃষ্ট মঙ্গলকাব্যগুলি সমাজ বিবর্তনের ধারা ও সমকালীন সমাজের প্রতিচ্ছবি। লোকজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ ও জগদ্দল ক্ষমতার প্রতিসরণের প্রতিবাদের মুখপত্র মধ্যযুগের এই কাব্যগুলি। প্রসঙ্গত, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য তুলে ধরতে পারি— ''সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। ... তেমনি সাহিত্যও দেশ ভেদে, দেশের অবস্থা ভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। ... সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।''[১] তাঁর মতে সাহিত্য নিয়মের সৃষ্টি। স্থান-কাল-দেশ ভেদে সাহিত্যের পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার ফলশ্রুতি উঠে এসেছে সাহিত্যের পাতায়। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সামনে রেখে বলা যায় যে, মধ্যযুগের কবিরাও কেউ সৃষ্টির অভিলাষি হয়ে কাব্য সৃষ্টি করতেন না। তার পিছনে থাকত সামাজিক-অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যকে তাঁরা আড়াল করে সামনে ধর্মীয় আবরণকে কাব্যে কাহিনীতে রূপদান করতেন। তাই বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক গোপাল হালদার মধ্যযুগের সাহিত্যে সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন— '' 'সাহিত্য' লিখব বলে তখন কেউ সাহিত্য রচনা করত না, তা রচনা করত সামাজিক কোনো উদ্দেশ্য বা প্রয়োজনের তাগিদে। আর একথাও আবার স্মরণীয়— তখন পর্যন্ত ধর্মই ছিল সমাজের প্রধানতম পরিচয়। ধর্মের সেই প্রধান গুরুত্ব কিছুমাত্র খর্ব না করেও বোঝা দরকার যে, ধর্মের নানা কথা ও কাহিনী আকারে ও আবরণে প্রকাশ লাভ করেছে সেদিনের মানুষের ধ্যান-ধারণা, বেদনা-আনন্দ; আর তারও অন্তর্নিহিত সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত, বর্ণ-বৈষম্য, বর্গ-বিরোধ এবং বর্গে-বর্গে আপোষ-রফা।''[২] তাই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য আলোচনার আগে এর আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে সমকালীন পরিচিত জগৎ-জীবনের পরিচয় রয়েছে। সেই জীবন দ্বন্দ্বে মুখর। সেই দ্বন্দ্ব কেবল বাইরের নয়, অভ্যন্তরেও। মঙ্গলকাব্যের বিশেষ শাখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই দ্বন্দ্ব কখনো আর্য-অনার্য ধর্ম-সংস্কৃতির, কখনো তা শিব-শক্তির সংঘর্ষ, আবার কখনো তা ব্রাহ্মণ্য-অব্রাহ্মণ্যের বা উচ্চশ্রেণীর সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর বা পৌরাণিক-লৌকিক ধর্ম সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বাইরের কাঠামোতে পৌরাণিক ও লৌকিক বা দেবখণ্ড, ব্যাধখণ্ড ও বণিক খণ্ডের বিন্যাসে সংঘাতের আভাস রয়েছে। কিন্তু এর অভ্যন্তরে রয়েছে চরম সমাজ-বাস্তবতা, চিরাচরিত শ্রেণী সংঘাতের ছবি, যার মূল ভিত্তি হল অর্থনৈতিক কাঠামো। এই

সামাজিক শ্রেণী-দ্বন্দ্ব মধ্যযুগে ও বিশেষত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর লড়াইয়ের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মতাদর্শের এই বিরোধটিকে একটি ধর্মীয় আদর্শের সঙ্গে অন্য একটি ধর্মীয় আদর্শের বিরোধ বলে মনে হলেও এর একদিকে রয়েছে আধিপত্য বিস্তারকারী বণিক শ্রেণী, বিশেষত, সমাজে প্রতিষ্ঠিত বণিকশ্রেণী। অন্যদিকে, সংগ্রামী প্রতিষ্ঠাকামী ব্রাত্যরা। তারাই সমাজের কল্যাণকারী। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের উচ্চশ্রেণীর ধনী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে ভাঁড়ু দত্ত, ধনপতি ও বণিকসম্প্রদায়। অন্যদিকে, কালকেতু ও অন্যান্যরা সমাজে অবহেলিত, নিপীড়িত। কিন্তু সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করার জন্য তারা সংগ্রাম করেছে।

প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী অরবিন্দ পোদ্দার মঙ্গলকাব্যগুলির সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন— ''বাংলার সমাজ-জীবনে যে সময়টা সাধারণভাবে মধ্যযুগ বলে অখ্যাত সেই যুগের বিচিত্র আবহাওয়ায় স্নান করেই মঙ্গলকাব্যগুলির আবির্ভাব। এই সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্রীয় ওঠা-নামা, একটানা ভাঙ্গা আর ভাঙ্গা, এবং ভাঙ্গার কলুষ-স্পর্শ থেকে বাঁচার আকুল আকূতিতে মুখর। বিভিন্ন রাজা ও ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ আশ্রয়ী রাষ্ট্রের আসা-যাওয়া এবং সামাজিক আবর্তের কম্পন লৌকিক জীবনেই অনুভূত হয় সর্বাপেক্ষা বেশী।''[৩] সেই লোকজীবনের কথা মধ্যযুগের কাব্যগুলির উপজীব্য। মধ্যযুগের এই লৌকিক জীবন বিধৃত মঙ্গলকাব্যগুলির সমস্তটাই ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মকে সামনে রেখে সমাজ গঠিত, আবর্তিত ও আলোড়িত। তাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং মতাদর্শ। এই বিভিন্ন গোষ্ঠী ও মতাদর্শ সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পিষ্ট গণমানসের দীর্ঘ পুঞ্জিভূত বিক্ষোভের ফলশ্রুতি। তারই চূড়ান্ত আত্মপ্রতিষ্ঠার উদগ্র বাসনা থেকে লৌকিক ধর্মের আধারে মঙ্গলকাব্যের কাহিনীতে তা আশ্রয় লাভ করে। তার কারণ হিসাবে দুটি যুক্তি দেওয়া যায়— (এক) মধ্যযুগে সামন্ততান্ত্রিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় ধর্মই ছিল প্রধান পরিচয়, তাই ধর্মীয় আবরণের আড়ালে এইসব মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়ে থাকবে। এবং (দুই) শাসক শক্তির প্রচণ্ডতার হাত থেকে রক্ষার জন্য ধর্মাশ্রয়কে অবলম্বন করা কবিদের একমাত্র কৌশল হয়ে উঠে। লক্ষণীয়, কবিরা উদ্দেশ্যকে সফলতা দানের জন্য দেবদেবীর স্বপ্নাদেশকে কৌশল হিসাবে কাব্যে রূপদান করে থাকেন। তাই ধর্মকে ব্যবহার করা হত অমোঘ অস্ত্র হিসাবে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও সমাজ বিশ্লেষক গোপাল হালদার বলেছেন — ''... এই শাসক-ধর্ম ও শাসক-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শাসিত-ধর্মের ও শাসিত-সংস্কৃতির প্রতিরোধের সাহিত্য।''[৪] মঙ্গলকাব্য বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে শাসক ও শাসিতের স্বার্থ-দ্বন্দ্বের কাহিনী ঐতিহ্যের মূলকথা। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় কাঠামোর স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজন। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় বা তার মধ্যেকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সমন্বয়ের ইতিবৃত্ত। এই সংঘর্ষ ও সমন্বয় জানতে গেলে ভারতের বহিরাগমনকে কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে ধরে নিতে হয়— (এক) আর্য-আগমন

এবং (দুই) তুর্কী আগমন। আর্য আগমনে ভারতের অনার্যদের সঙ্গে যেমন সংঘর্ষের সৃষ্টি হয়েছে, তেমনি দুটি জাতির সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় ঘটেছে। এর ফলে পৌরাণিক সমাজ-সংস্কৃতির ধর্মের সঙ্গে লৌকিক সমাজের সমন্বয় ঘটেছে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও সমাজ বিশ্লেষক গোপাল হালদার বলেছেন— ''এই প্রতিরোধেরও তলায়-তলায় ও ভেতরে- ভেতরে আবার জড়িত হয়ে আছে সমাজের নিম্নবর্গের সঙ্গে উচ্চবর্ণের সংঘর্ষ, তাদের বিরোধ ও পরস্পরের বোঝাপড়া; আবার, অন্যদিকে লোক-সমাজে ও লোক-সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মালম্বী সাধারণ মানুষের মিলন-মিশ্রণ।''[৫] উচ্চবর্ণের শাসকরা শাসন-শোষণ কায়েম রাখতে একটি মতাদর্শকে ব্যবহার করেছিল। সেটি হল হিন্দুধর্ম বা পৌরাণিক ধর্ম। অন্যদিকে, নিম্নবর্ণের শোষিতরা শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য অন্য একটি মতাদর্শকে আঁকড়ে ধরেছিল। তা হল লৌকিক ধর্ম বা বৌদ্ধধর্ম। একটি আর্যদের ধর্মাদর্শ, অপরটি অনার্যদের। সর্বধর্ম সমন্বয়ের বৃহৎ দেশ ভারতবর্ষে এই দুই জাতি-সংস্কৃতির সংঘাত যেমনি হয়েছে, তেমনি সমন্বয়ও ঘটেছে। সেই সমন্বয়ের বীজ থেকে মধ্যযুগে নতুন মঙ্গলকাব্যের মহীরূহের সৃষ্টি হল। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— ''হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংঘাতের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ যেমন সংস্কৃত পুরাণগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল, বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের প্রথম সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ তেমনই মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব হইয়াছিল।''[৬] তাই মঙ্গলকাব্যের অন্যতম শাখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের প্রতি যেমন দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন, তেমনি তুর্কী আক্রমণ ও তার প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস অনুধাবন করা প্রয়োজন।

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে আর্যরা উত্তরাপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। সেই সময় আমাদের দেশে দ্রাবিড়, মোঙ্গল ও কোল প্রভৃতি অনার্য জাতির বসবাস ছিল। আর্যরা এসে তাদের পরাজিত করল এবং তারা সমাজ পরিচালনার জন্য সমাজকে চারটি বর্ণে ভাগ করল। তারা হল যোদ্ধৃশ্রেণী (ক্ষত্রিয়), পুরোহিতশ্রেণী (ব্রাহ্মণ) ও সাধারণ জনগণ (বৈশ্য-শূদ্র)। যেমন, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আর্য সংস্কৃতির এই ধারাকে বণিকশ্রেণীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। তারা নিজ রাজ্যের প্রয়োজনে বার বার বিভিন্ন রাজ্যে বাণিজ্য যাত্রা করেছে। অন্যদিকে, সমগ্র সমাজকে ভিন্ন রাজ্য তথা শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে ক্ষত্রিয়শ্রেণী আর এই সমাজকে পরিচালনা বা নানা শুভ-অশুভ আদেশ দিবে ব্রাহ্মণ। সেই দিক থেকে ব্রাহ্মণরা ছিল সমাজ প্রধান। মানিক দত্তের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে 'ব্যাধ খণ্ড'-এ কালকেতু কলিঙ্গরাজ কর্তৃক বন্দী হলে ফুল্লরা ব্রাহ্মণের কাছে স্বামীর মুক্তির জন্য কাতরোক্তি জানায়। স্বাধীন নানা বৃত্তিধারী ও কৃষিজীবী পরিবারের অন্তর্গত বৈশ্য ও শূদ্ররা। সমাজে এদের উপর ছিল খাদ্যবস্তু ইত্যাদির ভার। অন্যদিকে, শূদ্রদেরকে তখন 'অসুর', 'শত্রু', 'দাস' ও 'ব্রাত্য' বলা হত। তাদের অবস্থান ছিল পূর্ব ভারতে। উত্তর ভারতের

আর্যরা কোন কাজে পূর্ব ভারতে এলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। আর্যদের মধ্যে এই ব্রাত্যরা পরবর্তীকালে আর্যসংস্কৃতি থেকে আলাদা হয়ে যায়। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন বলেছেন— ''যাহাদের মর্যাদা গ্রাম্যদের তুলনায় অনেক কম ছিল, তাহাদের নাম ছিল 'ব্রাত্য'। পরবর্তী কালে শব্দটির আসল অর্থ লোপ পাওয়ায় নিন্দার্থক অর্থ আসিয়া যায়, এবং তাহা হইতে 'ব্রতবাহ্য' অর্থাৎ আর্য-সংস্কৃতিচ্যুত এই মানে দাঁড়াইয়া যায়।''[৭] আর্য-সংস্কৃতি থেকে চ্যুত মানুষ ছাড়া আর্য নয় অর্থাৎ দ্রাবিড়, অস্টিক ও কোল গোষ্ঠীদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি কালক্রমে গড়ে উঠেছিল। তবে উভয়ের মধ্যে আপাত সাংস্কৃতিক পরিচয় থাকলেও পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে উভয়ের মধ্যে জীবনযাত্রা, আচার-বিচার ও চিন্তা-ভাবনার আদান-প্রদান হয়ে গেছে। ক্রমে ক্রমে আর্য সভ্যতার ভাষা, ধর্ম প্রণালী, স্মৃতিসংহিতা, দর্শন-মনন প্রভৃতি উত্তর ভারতীয় সংস্কার পূর্ব ভারতে বিস্তার লাভ করল। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, স্মৃতিসংহিতায় অনার্য ম্লেচ্ছভূমিতে অসংকোচে প্রবেশ করল। ফলে জাতিগত ব্যবধান অনেকটাই হ্রাস পেল। এই মিলনও ঘটেছে সংঘর্ষের ফলেই। আর্যদের সমাজ ছিল পশুচারী, আর অনার্যদের ছিল কৃষিপ্রধান সমাজ। ফলে অনার্যদের কৃষিক্ষেত্রে আর্যদের গোধন বিচরণকে কেন্দ্র করে উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ বাঁধে। বিরোধ এক সময় সমাপ্ত হয়, কিন্তু সেই দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে উভয়ের উভয়কে জানা হয়ে যায় অজ্ঞাতসারে। আর্যদের পুরাণ সংস্কৃতি তথা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতিতে পুরুষ দেবতারাই সমাজে প্রধান ছিল। প্রসঙ্গত, তাদের সমাজ ছিল পুরুষ প্রধান। অন্যদিকে, আর্য নয়, তাদের সমাজ ছিল নারী প্রধান। তাই তাদের দেব-দেবীরা ছিল স্ত্রী দেবতা। অনার্যদের কৃষিজ প্রধান জীবিকায় সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। তার ফলে তারা মাতৃ পূজা বা শক্তির আরাধনাকে বিশেষ প্রাধান্য দিত। এই নারীকেই শক্তি বা সৃষ্টির উৎস বলে গণ্য করা হল। তার ফলে হিন্দু তন্ত্রে এই শক্তির দেবীকে সহজেই গ্রহণ করল। প্রসঙ্গত, আমরা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও সমাজ বিশ্লেষক গোপাল হালদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য বলে মনে করি— ''... নারী 'শক্তি' রূপে আবিষ্কর্তা হইলেন; মনে পড়িল নারীই মানুষের জীবনধাত্রী প্রকৃতির প্রতীক। সমকালবর্তী হিন্দুরাও এই আবিষ্কারকে অঙ্গীভূত করিয়া লইতে দেরী করিল না।''[৮] তবে সমাজের এই নিম্নস্তরের মানুষদের সংস্কৃত ভাষায় লেখা গ্রন্থ পাঠের অধিকার ছিল না। সাধারণ মানুষ তথা আর্য নয় যারা, তারা পরকালের সুখ শান্তি কিংবা কোন পাপ কার্য থেকে মুক্তির জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা নানা রকম অর্থনৈতিক-সামাজিক শোষণ সহ্য করত। এই শোষণ অত্যাচারের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করার জন্য আনুমানিক খ্রীষ্টীয় পূর্ব ৬০০ তে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব হয়। লক্ষণীয়, পূর্বভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তথা হিন্দুধর্মের প্রাবল্য ছিল যেখানে, সেখানেই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বীজ উদ্‌গম হয়। বিবর্তনের ইতিহাসে খ্রীষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক মৌর্য বংশের রাজা

অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সাধারণ মানুষের ধর্ম রাজা গ্রহণ করায় সমাজে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার মৌর্য-আমলে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। মৌর্য আমলের পর ভারতবর্ষে আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৩২০ অব্দে গুপ্তরা শাসন কার্যের হাল ধরে। তারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। তারা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সর্বপ্রান্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল। তারা একদিকে যেমন পররাজ্যগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছিল তেমনি পূর্ব ভারতে কিরাত-নিষাদ-ব্রাত্য জনগোষ্ঠীর ওপর ধীরে ধীরে পৌরাণিক ও স্মার্ত আদর্শে দীক্ষিত করতে থাকে। এই সময় সনাতন হিন্দু ধর্ম প্রতিষ্ঠা পায়। হিন্দু ধর্মের পুরুষ দেবতা বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ধর্ম এবং শিবকে কেন্দ্র করে শৈব ধর্মের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ্ ও সমাজ বিশ্লেষক গোপাল হালদার আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে নিম্নশ্রেণীর অনার্য মানুষদের সামাজিক অবস্থান বোঝাতে গিয়ে বলেছেন— ''এই হিন্দু-সংস্কৃতির চক্ষে সমাজের উৎপাদকশ্রেণীর স্থান কত নিম্নে। তাহারা রহিল শূদ্র ও অন্ত্যজ হইয়া; মানুষের অধিকার হইতে তাহারা সর্বভাবেই বঞ্চিত হইয়া রহিল। প্রায় তেমনি বঞ্চিত রহিল স্ত্রীজাতি।''[৯] এমনকি, সমাজে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম নতুন করে পত্তনের জন্য তাদের রাজসভায় গড়ে উঠেছিল সংস্কৃত চর্চার নবরত্ন। জন সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধধর্মে প্রাবল্য লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুরবস্থা অতিক্রম করার জন্য দক্ষিণ ভারত থেকে বেদ-পুরাণ জ্ঞান সম্পন্ন পণ্ডিতদের পূর্বভারতে নিয়ে আসা হয়। তাদের দ্বারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। এই আমলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন বাংলায় এসে তাম্রলিপিতে দু-বছর সূত্র সমূহ নকল করতে এবং বৌদ্ধমূর্তি সমূহ অঙ্কনের জন্য যাপন করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ ভারতের বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কথা তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে বলে গেছে।

এরপর ৬০৬ খ্রীষ্টঅব্দের আগে বাংলার রাজা হয় শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত। তাঁর মৃত্যুর পর প্রায় একশ বছর (আনুমানিক ৬৩৫-৭৫০) ধরে বাংলার বুকে সূচনা হয় 'মাৎস্যান্যায়'-এর। বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। এরূপ চরম ভয়াবহ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সে সময় সাধারণ মানুষের থেকে প্রথম নির্বাচিত রাজা গোপাল পালকে (৭৫০-৭৭০ খ্রী:) বাংলার মসনদে বসানো হয়। পালবংশ ছিল বৌদ্ধধর্মালম্বী। এই সময় বৌদ্ধধর্মের পুনরায় বিস্তার পায়। এই ধর্ম ছিল সাধারণ মানুষের কাছে উদার। তার ফলে নিম্নশ্রেণীর বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কার এই ধর্মের সঙ্গে মিশ্রণে বাঁধা রইল না। এই যুগে ধর্ম-সংস্কৃতির মিশ্রণ সম্বন্ধে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— ''পালরাজগণের সময় হইতেই সম্ভবত বঙ্গদেশে প্রচলিত মহাযান বৌদ্ধধর্মের সহিত স্থানীয় কতকগুলি লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। তাহারই ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে মিশ্র কতকগুলি লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব হয়।''[১০] অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ

পর্যন্ত পালবংশ বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। পালবংশের পতনের পর সেনবংশ বাংলায় ১২০৩ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করে। তারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে। 'মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের রচয়িতা আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন— ''সেনরাজগণের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করিলেও এতকালের দেশীয় ধর্ম-সংস্কৃতির যে উপাদানসমূহ এদেশের সমাজের একাবারে মজ্জায় গিয়া স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা একেবারে পরিত্যক্ত হইল না। সমাজে ক্রমে পুরাতন ধর্ম-বিশ্বাসের মূল শিথিল হইয়া নবাগত আদর্শের উপর আশা ও আশ্বাস স্থাপিত হইল সত্য, তথাপি রক্ষণশীল এই সমাজ পুরাতনকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিল না; তাহারা নূতনকে যে ভাবে গ্রহণ করিল, তাহা পুরাতনেরই রূপান্তর মাত্র হইল— এই প্রদেশের প্রচলিত ধর্মসংস্কারই যুগোচিত পরিমার্জনা মাত্র লাভ করিয়া সমাজের অন্তস্তলে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করিতে লাগিল।''[১১] হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষত্বই তাই। প্রাচীনের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করে চলা। অতীতে যা ছিল তা সরাসরি অস্বীকার না করে যথাসম্ভব তার সঙ্গে বাহ্যিক একটি সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করা। অল্প বিস্তর পরিবর্তন যুগে যুগে প্রত্যেক সমাজেই ঘটতে থাকে। তা সকলের সমর্থনের জন শাস্ত্র রচনা তথা দেশীয় সংস্কৃতির টীকা টিপ্পনী রচনা করা হত। সেগুলি অনেকাংশে লৌকিক আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই জন্যই গুরুতর পরিবর্তন ঘটলেও প্রাচীন সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করে চলত হিন্দু সমাজ। সঙ্গে নতুন নতুন টীকা রচনা করে কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনরে সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটতে দেয়নি। হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষত্বই তাই। প্রাচীনের সঙ্গে যোগ সূত্র রক্ষা করে চলা, অতীতে যা ছিল তা সরাসরি অস্বীকার না করে যথা সম্ভব তার সঙ্গে বাহ্যিক সামঞ্জস্য রক্ষার চেষ্টা করা। অল্প বিস্তর পরিবর্তন প্রতি সমাজেই যুগে যুগে ঘটে থাকে। তা সকলের সমর্থনের জন্য শাস্ত্র রচনা তথা দেশীয় সংস্কৃতির টীকা-টিপ্পনী রচনা করা হত। সেগুলি অধিকাংশে লৌকিক আচরণের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এই জন্যই গুরুতর পরিবর্তন ঘটলেও হিন্দুরা প্রাচীন সংস্কৃতির মর্যাদা রক্ষা করে চলেছে। সঙ্গে নতুন নতুন টীকা রচনা করে কালের অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বাসের অভাব ঘটতে দেয়নি। এইভাবে পৌরাণিক সংস্কৃতির পাশে বৌদ্ধ ও লৌকিক ধর্ম-সংস্কৃতি বছরের পর বছর সমান গতিতে চলতে থাকে।

এরপর আসা যাক, দ্বিতীয় বহিরাগমনের কথায়। তুর্কী আক্রমণের আগে পর্যন্ত সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি দুটি স্বতন্ত্র ধারায় প্রবাহমান ছিল। একদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতি, অন্যদিকে লৌকিক বা সাধারণ মানুষের ধর্ম-সংস্কৃতি পাশাপাশি সমান্তরালে এগিয়ে চলছিল। এছাড়া হিন্দু সমাজে তান্ত্রিক সাধনা প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়। তান্ত্রিক সাধনার সঙ্গে এই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগেই মিলিত হয়ে হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধতন্ত্রের রূপ লাভ

করে। কেননা অনার্য সমাজে নারীকে শক্তিরূপিনী হিসাবে মানা হত। সেই শক্তির দেবীর সঙ্গে হিন্দুরা তার তন্ত্রশক্তির সাজুয্য অনুভব করল। বৌদ্ধধর্ম বৈদিক ধর্মের বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেও তান্ত্রিক সাধনার আচারের প্রতি অনীহা ছিল না বলে মনে হয়। তন্ত্রের যোগ সাধনায় মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি ও মুদ্রার গুহ্য শক্তিকে বৌদ্ধ ধর্মে ও হিন্দু ধর্মে গৃহীত হয়। এর পিছনে যুক্তি স্বরূপ আমরা শশিভূষণ দাশগুপ্তের দুটি মন্তব্য তুলে ধরতে পারি। তিনি বলেছেন— ''চতুর্থ-পঞ্চম শতকে অসঙ্গের সময়ে তাঁর দ্বারা বৌদ্ধধর্মে যে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে — এই অনুমান কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থিত হয়।''[১২] এছাড়া তিনি আরও বলেছেন— ''তান্ত্রিকতার প্রধান লক্ষণগুলি হিন্দু অথবা বৌদ্ধধর্ম-সঞ্জাত নয়। এটি ভারতের একটি সুপ্রাচীন ধর্মমত বা সাধনা-প্রণালী;— হিন্দুদর্শন ও ধর্মের সংস্পর্শে তা কোথাও হিন্দুতন্ত্র এবং বৌদ্ধদর্শন ও ধর্মভাবের সংস্পর্শে কোথাও বৌদ্ধতন্ত্রে রূপ লাভ করেছে।''[১৩] তবে কোথাও হিন্দুধর্মের রক্ষণশীলতার গণ্ডী অতিক্রম করে বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রবেশ করা বাধ্যতামূলক প্রয়োজন দেখা দেয় নি।

এই অবস্থায় উভয়কে একত্রিত করতে তুর্কী আক্রমণের মত একটি বর্হিরাক্রমণের প্রয়োজন ছিল। সুকুমার সেন বলেছেন— ''নবীন- প্রবীণের এই সংস্কৃতিগত অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসগত, আচারব্যবহারগত ও ভাবধারাগত দুস্তর স্তরভেদ দ্রুতগতি বিলুপ্ত হইয়া একটি জমাট বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিবার অন্তরায় ছিল একটি প্রধান বস্তুর অভাব — বাহিরের আঘাত অর্থাৎ তৃতীয় পক্ষের সংঘাত। যেমন দুই পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এক পরমাণু অক্সিজেন মিলিত হইয়া জলকণা হইতে গেলে প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তির মধ্যস্থতা (Catalytic agent) চাই তেমনি দুই সংস্কৃতি ও ভাবধারা মিলিয়া সহজে একটি অখণ্ড সংস্কৃতিতে ও ভাবধারায় পরিণত হইতে গেলে বাহ্য সংঘাতের বা আভ্যন্তর শক্তিস্ফুরণের অপেক্ষা রাখে।''[১৪] নবীনরা ছিল চিন্তাশীল শাস্ত্রাদর্শবাদী, যজ্ঞা বা পূজাপার্বণ, তন্ত্রানুসন্ধিৎসু ও সংযম নিষ্ঠ, আর প্রবীণ তথা সাধারণ প্রাকৃতরা ছিল দৈববাদী ব্রত পরায়ণ, সঙ্গীতসাহিত্যরস লিপ্সু ও অধ্যাত্মনিষ্ঠ। তুর্কী আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত এই দুই স্তরে ধর্ম, দেব-দেবী, সংস্কৃতি স্বতন্ত্র ছিল।

হঠাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে (সম্ভবত ১২০২ খ্রী: অব্দ) বিজাতি, বিধর্মী, বিভাষি তুর্কী আক্রমণের ঝড় বাংলার উপর বয়ে যায়। তুর্কী-নেতা মহম্মদ-বিন-বখতিয়ার খিলজী মুসলমান ধর্ম প্রচারের জন্য হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেব-দেবী, মঠ-মন্দির ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ যারা এতদিন হিন্দুধর্মের মানুষের দ্বারা অবহেলিত ছিল তাদেরকে বিজয়ীরা অত্যন্ত কৌশলে ও নিজেদের ধর্মের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্য শাসনকার্যে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করে। অন্যদিকে, এই 'অস্পৃশ্য' অবহেলিত মানুষগুলি হিন্দু সমাজের দণ্ড মুণ্ড কর্তাদের উপযুক্ত জবাব দিতে ইসলামধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করে। প্রসঙ্গত, অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন— ''হিন্দু-

সামাজিক সংস্থার নির্মম বিধানে যারা নির্যাতিত হচ্ছিল, — বর্ণ-সমাজের অন্তর্গত নিম্ন বর্ণগুলি এবং বর্ণ-সমাজের বাইরের অস্পৃশ্য জাতিগুলি— তারা ঐসলামিক সমাজ-সংস্থায় আশ্রয় গ্রহণ করে সামাজিক নির্যাতন থেকে মুক্তিলাভ করেছে। হিন্দু সমাজের বিধান-দাতাদের নিকট যারা ছিল শূদ্র এবং অস্পৃশ্য পর্যায়ের, ইসলাম তাদের দিলো মুক্ত মানুষের অধিকার, এবং তাই নয়, ব্রাহ্মণদের উপরেও প্রভুত্ব করার ক্ষমতা।''[১৫] হিন্দু সমাজের এই আত্মক্ষয় লক্ষ্য করে ব্রাহ্মণরা নিম্নশ্রেণী তথা সাধারণ মানুষদেরকে কাছে টানতে সচেষ্ট হয়। প্রসঙ্গত, গোপাল হালদার বলেছেন— ''তুর্ক আক্রমণের ফলে প্রধানত যে সামাজিক পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ল। তা সংক্ষেপে এই :

(১) উচ্চ ও নিম্নবর্গের হিন্দুদের সংযোগ নিকটতর হল।

(২) পরাজিত হিন্দু-সমাজ এক সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট হল; এবং

(৩) প্রথমে হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের ঐক্যও ক্রমে হিন্দু-মুসলমান উচ্চবর্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলে পর মুসলমান বিজেতারা বাঙালী হয়ে উঠলেন, আর বিদেশীয় রইলেন না।''[১৬]

এরূপ সামাজিক-সংহতির কারণ ও তার ফলস্বরূপ সম্বন্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকার সুকুমার সেন বলেছেন— ''বাঙ্গালা দেশের দুই স্তরের মিলনের জন্য তুর্কী-অভিযানের মতো এক আকস্মিক সংঘর্ষের আবশ্যক ছিল। ইহাই বাঙ্গালা দেশে তুর্কী অভিযানের একটি ভালো ফল।''[১৭] বাংলাদেশে লৌকিক উপাদানের সঙ্গে পৌরাণিক ও শাস্ত্রীয় বোধ বুদ্ধির যে সংমিশ্রণ হয়েছিল তার ফলশ্রুতিতে মঙ্গলকাব্যগুলির সৃষ্টি হয়েছিল। নিম্নবর্গের তথা লৌকিক সমাজে এতদিন লখিন্দর-বেহুলা, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, লাউসেন-রঞ্জাবতীর উপাখ্যান এবং কৃষ্ণ-শিবের নামে প্রচলিত কাহিনী প্রচলিত ছিল। তাদের স্ত্রী দেবতা বা বিশ্বাস থেকে উদ্‌ভূত দেব-দেবীকে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা অবজ্ঞার চোখে দেখত। তাদের কাছে সংস্কৃত শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য প্রভৃতি শ্রদ্ধার ও সমাদরের বিষয় ছিল। কিন্তু তুর্কী আক্রমণে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা ক্ষমতাচ্যুত ও অস্তিত্ব রক্ষার আশঙ্কায় নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষের মনসা, বনচণ্ডী, চাষী-দেবতা শিব ও প্রণয়বিলাসী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ মাহাত্ম্যকে স্বীকার করে নিল। অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন— ''বহিরাগত আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বাংলার নিজস্ব অধিবাসীদের অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে শতাব্দী ব্যাপী লেনদেন সংমিশ্রণ ইত্যাদি হয়ে থাকলেও তাদের সমবায়ে নবতর সংস্কৃতি ও নবতর জাতীয় জীবন গঠিত হয়েছে একথা বলা চলে না। তারা সংমিশ্রিত হয়েছিল, কিন্তু যেন রাসায়নিক অর্থ মিলিত হয়নি। এমনকি, সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য আদর্শে সমাজ সংগঠনের ব্যাপক প্রচেষ্টা হ'লেও তাতে শুধুমাত্র কাঠামো স্থাপন হয়েছিল, কাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখে যে প্রাণ তার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি। এবার

মুসলমান আক্রমণের আঘাতে আর্য-অনার্য সংস্কৃতির স্ব স্ব সীমা আপনা থেকেই মুছে যেতে আরম্ভ করে, এবং উভয়ের সংমিশ্রণে গড়া এক নতুন আদর্শ আত্মপ্রকাশ করে। আর্যের প্রজ্ঞাধর্মী জীবনবাদের সঙ্গে অনার্যের বস্তুনিষ্ঠ প্রাণধর্মিতা এসে মিলিত হয়; আর্যের চিন্তা ও মনন অনার্যের সজীব ক্রিয়াশীলতার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর এই সমন্বিত রূপের উপর সামগ্রিকভাবে বর্ষিত হলো ইসলামের প্রভাব।''[১৮] অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন— ''ইসলামের বিজয়ের আরও একটি অমূল্য অবদান হলো, লৌকিক ভাষা ও সাহিত্যের আবির্ভাব ও বিকাশ। আর এই সাহিত্যের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের বিকাশের সূত্রপাত।''[১৯] বৌদ্ধধর্মের মানুষরাও এই সময় হিন্দু সমাজে মিশে যায়।

উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণরা সমাজের ভাঙনকে রক্ষার জন্য দুটি কাজ করল— (১) লৌকিক, বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, দেব-দেবীকে ব্রাহ্মণরা মেনে নিল। তার ফলে সৃষ্টি হল মঙ্গলকাব্যের। একই সঙ্গে একই মঙ্গলকাব্যে নিম্নশ্রেণীর অন্ত্যজ ব্যাধদের কথা, অন্য খণ্ডে সমাজে বর্ণপ্রধান বণিকদের কথা বলা হচ্ছে। পুরাণের সূর্য, বিষ্ণু, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি দেবদেবীর সঙ্গে মনসা, চণ্ডীর মত অপৌরাণিক দেবতা ও চৈতন্যের মত মানুষ দেবতার বন্দনা গাওয়া হল। পুরাণ দেবদেবীর সঙ্গে লৌকিক দেবদেবী সম্বন্ধ স্থাপন, পুরাণের চরিত্রে লৌকিক স্বভাব ধর্ম সঞ্চালন, এবং দেবতাদের মর্ত্য মাটিতে সাধারণ মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ করা তার প্রমাণ দেয়। অন্যদিকে, (২) রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত পুরাণ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হত বলে সাধারণ মানুষের কাছে তা পাঠের অযোগ্য ছিল। তার ফলে— ''তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন।''[২০] সংস্কৃত পুরাণগুলিকে বাংলায় অনুবাদ করে সাধারণ মানুষের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি আস্থা ও মনোসংযোগ পোক্ত করা হল। প্রসঙ্গত, গোপাল হালদারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য— ''উচ্চবর্গের ও নিম্নবর্গের এই সংযোগের ও সামাজিক আপোষ-রফার ফলে বাঙ্‌লা সাহিত্য দুইভাবে ঐশ্বর্য লাভ করল : একদিকে বাঙালীর নিজস্ব লৌকিক ধর্ম ও আখ্যায়িকাগুলি (Matter of Bengal) 'মঙ্গলকাব্য' রূপে বিকাশ লাভ করল; অন্যদিকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির অমর আখ্যায়িকাও (Matter of Sanskrit) বাঙ্‌লায় অনূদিত ও রচিত হতে লাগল।''[২১]

রাজনৈতিক দিক দিয়ে তুর্কী আক্রমণের পর তথা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বাংলায় সুস্থিত অনুকূল পরিবেশ লক্ষ্য করা যায়। ইতিহাস থেকে জানা যায়, তুর্কী বিজয়ের পর দিল্লীর সুলতান কুতুব উদ্দীনের অধীনস্থ সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খলজী সর্বপ্রথম নদীয়া বিজয়ের মাধ্যমে লক্ষ্মণ সেনের বাংলায় মুসলমান রাজত্বের সূচনা করেন। তিনি গৌড় বা লক্ষণাবতী অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন এবং বাংলা দিল্লী সুলতানদের একটি প্রদেশে

পরিণত হয়। দিল্লীর সুলতানরা বাংলার শাসন কার্য পরিচালনার জন্য এক বা একাধিক গভর্ণর নিয়োগ করতেন। দিল্লী থেকে দূরতম স্থানে বাংলা প্রদেশে অবস্থিতি, অনুন্নত ও প্রতিকূল যাতায়াত ব্যবস্থা, জলবায়ু বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদী বর্ষা ঋতু প্রভৃতি কারণে বাংলায় নিয়োজিত গভর্ণররা প্রায়ই বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন। যার ফলে নিরবিচ্ছিন্ন দিল্লীর সুলতানী শাসন বাংলায় কখনই দীর্ঘায়িত হয়নি। আবার দিল্লীর কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা বা কেন্দ্রীয় শাসন নির্বাচনের ব্যাপারে সৃষ্ট অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং গোলযোগের সুযোগ নিয়ে কেউ কেউ নিজেদেরকে স্বাধীন শাসক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন। অবশেষে ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে মুহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালে বাংলায় ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ কর্তৃক স্বতন্ত্র স্বাধীন সুলতানী শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সুদীর্ঘ দুই শত বছর পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি (১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দ) শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহ বাংলার সিংহাসনে আসীন হন এবং কালক্রমে ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলায় একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন।

বাংলায় ইলিয়াস শাহী বংশের স্বাধীন রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর দেশের অবস্থা স্বাভাবিক হতে থাকে। তার সময় থেকে বাংলায় জ্ঞানচর্চা ও সাহিত্য অনুশীলনের পুনরম্ভের সুস্পষ্ট ফল পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে লক্ষ্য করা যায়। সুকুমার সেনের কথায়— '' ... এ দেশে তুর্কী আক্রমণের সময়ে চারটি প্রধান ধর্মমত প্রচলিত ছিল।''[২২] সেই ধর্মমতগুলি হল— (১) দেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্যবাহিত গ্রামদেবদেবী পূজা (যার মধ্যে বৈদিক দেবতা আছে, পৌরাণিক দেবতা আছে, বাইরের দেবতা আছে, নতুন পরিগৃহীত দেবতাও আছে); (২) মহাযান বৌদ্ধমতের একটি বিশেষ ও স্থানীয় রূপ; (৩) যোগী মত (যার সঙ্গে শৈবমতের সংস্রব ছিল); এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যমত (যার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিষ্ণু-শিব-চণ্ডী-উপাসনা)।

তুর্কী তথা মুসলমান অধিকারের প্রথম দুই-তিন শতাব্দীর মধ্যে এই চারটি ধর্মমর্তের ধারা মিলে মিশে সাহিত্যে দুটি প্রধান ধারায় পরিণত হয়।

(১) পৌরাণিক; যা অর্বাচীন, নবাগত, নবানীত-শাস্ত্র লব্ধ। এবং

(২) অ-পৌরাণিক; যা প্রাচীন, দেশীয় ঐতিহ্যগত। এই পৌরাণিক সংস্কৃতির ধারক ছিল ব্রাহ্মণরা। আর সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষরা ছিল অপৌরাণিক সংস্কৃতির ধারক। তুর্কী আক্রমণে নিম্নশ্রেণীর মানুষ মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উচ্চশ্রেণীর মানুষরা সমাজে তাদের অধিকার সুদৃঢ় করতে মঙ্গলকাব্যগুলি তাদের দ্বারা চরিত হতে থাকল। উল্লেখযোগ্য যে, এই নবাগত (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-ত্রয়োদশ) পুরাণগুলির মধ্যে সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এরূপ পুরাণগুলি হল 'মার্কণ্ডেয়পুরাণ', 'অগ্নিপুরাণ', 'কালিকাপুরাণ', 'দেবীভাগবত', 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' উল্লেখযোগ্য। এই সকল পুরাণে চণ্ডী, কালী, দুর্গার উল্লেখ ছিল। অন্যদিকে, অপৌরাণিক তথা

লৌকিক জগতে মনসা, মঙ্গলচণ্ডী এদেরকে নিয়ে প্রচলিত কাহিনীর সৃষ্টি হল। মধ্যযুগে এই দুটি ধারার মিলন কেবল দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনা করা প্রধান উদ্দেশ্য নয়। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মেল বন্ধন। যে চণ্ডীরূপে মার্কণ্ডেয় পুরাণে পূজিতা, যে আদ্যা শক্তি সৃষ্টির মূল কারণ এবং সাংখ্যে প্রকৃতি বলে অবিহিতা, সেই দেবী আর লৌকিক দেবীরা একত্রিত হয়ে মঙ্গ লকাব্যে রূপ লাভ করল। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের মঙ্গলচণ্ডী অস্পৃশ্য ব্যাধ সমাজের দেবী। সে বনে গোধিকা রূপে ব্যাধ কালকেতুকে দেখা দেয় এবং নিজেকে কালকেতু ও ফুল্লরার কাছে পুরুষ-প্রকৃতি রূপে পরিচয় দেয়। বণিক খণ্ডের খুল্লনার আরাধ্যা দেবীও এই দেবী থেকে ভিন্ন এবং সভ্য সমাজে মেয়েদের ব্রতের দেবী। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পুরাণোক্তা মহাদেবী দুর্গা ও চণ্ডীর সঙ্গে এবং মঙ্গলচণ্ডী ও ব্রতের দেবী অভিন্ন রূপে পরিগণিত হয়ে গেছে। এর সঙ্গে মিশে গেছে তন্ত্রের দেবী ভাবনা। কারণ স্বরূপ এই দুই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে গড়ে ওঠে মঙ্গলকাব্যগুলি। মনসামঙ্গল এই ধারার সৃষ্ট প্রথম ফসল, যা পঞ্চদশ শতাব্দীতে জীবনবাদের সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ প্রাণ ধর্মের মিলিত সত্তার বহিঃপ্রকাশ।

মনসামঙ্গল কাব্যের পাশাপাশি ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সৃষ্টি হল। এই কাব্যের দুটি কাহিনী রয়েছে। প্রথমত, কালকেতু ব্যাধের কাহিনী এবং দ্বিতীয়ত, ধনপতি সদাগরের কাহিনী। একটি নিম্নশ্রেণীর ব্যাধ জীবন নিয়ে এবং অপরটি উচ্চশ্রেণীর বণিক জীবনকে নিয়ে রচিত। তবে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই দুই খণ্ডের একই সঙ্গে সহাবস্থান। যার প্রধান দেবী চণ্ডী। তাকে কখন কালী, কখন আদ্যা বলা হচ্ছে। শিব সেখানে নিষ্ক্রিয়। মানিক দত্ত তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বর্ণনা দিয়েছেন এই ভাবে —

> ‘‘হুহুঙ্কার ছাড়ি ক্রোধে দিঞা করতালি।
> অসুর বুলিঞা শিবের বুকে চড়িলেন কালী।।
> পদ তলে শিবকে দেখি লজ্জা বড় পাল্য।
> দন্তে জিহ্বা ধরি কালী ক্রোধ নিবারিল।।’’[২৩]

কালী এখানে অসুর তথা মানব মনের অশুভ ও অন্যায়কে ধ্বংস করছে। উপরন্তু শিব তার পদতলে শবস্বরূপ তথা মৃত বা নিষ্ক্রিয়। অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালী বা চণ্ডী দেবীকে স্বক্রীয়, শক্তিশালী, ক্ষমতাবতী ও অসুর নাশিনী হিসেবে দেখা হয়েছে। কিন্তু সেন যুগেই শিব স্বক্রীয় এবং রাজানুকূল্যে পূজিত। বাঙালীর ইতিহাসকার নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন— ‘‘সেন-বংশের পারিবারিক দেবতা বোধ হয় ছিলেন সদাশিব। বিজয়সেন শিবের আবাহন করিয়াছিলেন শম্ভু নামে, বল্লালসেন করিয়াছেন ধুর্জটি এবং অর্ধনারীশ্বর নামে। লক্ষ্মণসেন এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় লিপিতে নারায়ণের আবাহন করিলেও সদাশিবকে শ্রদ্ধা জানাইতে ভোলেন নাই।’’[২৪] তবে কেন

তুর্কী আক্রমণের পর রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিব নিষ্ক্রিয় এবং চণ্ডী সক্রিয়। তার কারণ হতে পারে তুর্কী আক্রমণের পর মানুষ বিপর্যস্ত, পথভ্রষ্ট হয়ে যায়। সে সময় মানুষের মনোবাঞ্ছায় এমন এক দেবতা তথা শক্তিদেবীর আকাঙ্ক্ষা করেছিল যে কিনা সমস্ত দুরবস্থা, বিপদ দূর করে চলার সঠিক পথ নির্দেশ দিবে। 'দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য বলেছেন— ''মর্ত্ত্যবাসী দেবীর কৃপাপ্রার্থী হইলে তিনি তাহাদিগকেও বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়া সুখ-সম্পদ্ দান করেন, এই আশার বাণী শুনাইবার জন্য বাঙালী কবি দেবীর এই মর্ত্ত্যলীলা রচনা করিয়াছেন, ইহাই প্রচলিত বিশ্বাস।''[২৫] ব্যাধখণ্ডে অনার্য-দেবতা চণ্ডী নিজের প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্য যেকোন কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যপ্রধান রাজ্য কলিঙ্গে তার স্থান হল না। এই নিয়ে কলিঙ্গরাজ সুরথের সঙ্গে তার ভক্ত কালকেতুর লড়াই হল। তাতে তার স্থান মিলল সমাজের বাইরে গুজরাটের বনে। তবে যে দেবী নিম্নশ্রেণীর হিন্দু সমাজের মধ্যে নিজের গণ্ডীকে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াস পেয়েছিল। বণিক খণ্ডে দেখতে পাই ধনপতি বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত ও তার ইষ্ট দেবতা শিব। কিন্তু তার গৃহের দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনা অনার্য দেবী চণ্ডীর ব্রতদাসী। তার ফলে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বটি একই গৃহে বণিক খণ্ডে সুন্দর ও প্রশংসনীয়ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেই দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরাজয় লক্ষ্য করা যায়। বণিক খণ্ডে এসে ধনপতি অনার্য দেবীর শরণাপন্ন হল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়— ''বস্তুত সাংসারিক সুখদুঃখ, বিপৎসম্পদের দ্বারা নিজের ইষ্টদেবতার বিচার করিতে গেলে, সেই অনিশ্চয়তার কালে শিবের পূজা টিঁকিতে পারে না। অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার তরঙ্গ যখন চারি দিকে জাগিয়া উঠিয়াছে তখন যে দেবতা ইচ্ছাসংযমের আদর্শ তাঁহাকে সাংসারিক উন্নতির উপায় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দুর্গতি হইলেই মনে হয় আমার নিশ্চেষ্ট দেবতা আমার জন্য কিছুই করিতেছেন না, ভোলানাথ সমস্ত ভুলিয়া বসিয়া আছেন। চণ্ডীর উপাসকেরাই কি সকল দুর্গতি এড়াইয়া উন্নতিলাভ করিতেছিলেন? অবশ্যই নহে। কিন্তু শক্তিকে দেবতা করিলে সকল অবস্থাতেই আপনাকে ভুলাইবার উপায় থাকে। শক্তিপূজক দুর্গতির মধ্যেও শক্তি অনুভব করিয়া ভীত হয়, উন্নতিতেও শক্তি অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে। আমারই প্রতি বিশেষ অকৃপা ইহার ভয় যেমন আত্যন্তিক, আমারই প্রতি বিশেষ দয়া ইহার আনন্দও তেমনি অতিশয়। কিন্তু যে দেবতা বলেন 'সুখদুঃখ, দুর্গতিসদ্‌গতি— ও কিছুই নয়, ও কেবল মায়া, ও দিকে দৃক্‌পাত করিয়ো না।' সংসারে তাঁহার উপাসক অল্পই অবশিষ্ট থাকে। সংসার মুখে যাহাই বলুক, মুক্তি চায় না, ধনজনমান চায়। ধনপতির মতো ব্যবসায়ী লোক সংযমী সদাশিবকে আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারিল না; বহুতর নৌকা ডুবিল, ধনপতিকে শেষকালে শিবের উপাসনা ছাড়িয়া শক্তি-উপাসক হইতে হইল।''[২৬] লৌকিক মানুষ তাই শিবকে ত্যাগ করে শক্তিকে গ্রহণ করে। শক্তি, ক্ষমতা যার সীমাহীন, ইচ্ছা-অনিচ্ছা যার নিয়ন্ত্রণহীন, যা মানুষকে যেমন অনায়াসেই

সর্বোচ্চ শিখরে তুলতে সক্ষম, তেমনি খুব সহজেই অতল গহ্বরেও ডুবাতে সক্ষম। যেমন, দেবী চণ্ডী ভক্ত কালকেতুকে ব্যাধ থেকে রাজায় পরিণত করেছে এবং শিবভক্ত ভাঁড়ু দত্ত চরম বিপদে চণ্ডীকে মানতে বাধ্য হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তার প্রমাণ রয়েছে। ভাঁড়ু দত্ত চণ্ডী কর্তৃক বন্যায় প্রাণ বাঁচানোর জন্য বলে —

''জেই দিগে ভাড়ু চাহে সেই দিগে বাণ।
ভাড়ু বলে মহামাঞা রাখহ পরাণ।।''[২৭]

এমন এক শক্তির কল্পনার মাধ্যমে তার অপ্রতিহত প্রভাবের কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে মানুষ পরিবেশের বিপর্যয় এবং আঘাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে; সেই পরিবেশকে জয়ের চেষ্টা চালিয়েছে।

অন্যদিকে, মধ্যযুগের প্রারম্ভে মানুষ নানা ভাবে শোষিত, অত্যাচারিত হচ্ছিল। তার প্রমাণ পাই আমরা মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'গ্রন্থোৎপত্তির কারণ' অংশে। এবং গণেশের পুত্র যদু হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে এবং জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করে। সে প্রচণ্ড হিন্দু বিদ্বেষী হয়ে ওঠে। হিন্দু বৌদ্ধদের মন্দির-মঠ ভেঙে দেওয়ার পরিচয় পাই বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' কাব্যের শেষ খণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে—

''যে হুসেন সাহা সর্ব উড়িয়ার দেশে
দেবমূর্তি ভাঙ্গিলেক দেউশ বিশেষে।।''[২৮]

হুসেন শাহের আমলে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক অবস্থা সুস্থির স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না বলে মনে হয়। তাই মানুষ এমন এক দেবীর আশা করেছিল যে কিনা শক্তি রূপিনী, সৃষ্টির আদি, এবং অভয়া বা মাতৃরূপা। শক্তি-কল্পনার মধ্যে মানুষের দুটি সহজাত প্রবৃত্তি কাজ করেছিল সে সময়। একদিকে তার বাঁচার আকূতি, আত্মরক্ষার এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সংগ্রামের প্রেরণা এবং অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালনের আকূতি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন— ''পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতার ও ইহার প্রতিবিধানে আত্ম-ও রাষ্ট্র-শক্তির অপ্রাচুর্যের হেতু মানুষ নিজ-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা-ঐশ্বর্যের জন্য অতিমাত্রায় দৈব-শক্তির অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া পড়িল। বিশেষ দেবীর পূজা করিলে অভাব-অনটন, সাংসারিক আধি-ব্যাধি, শত্রুর অভিভব ও উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে এইরূপ একটি বিশ্বাস সার্বজনীন হইয়া উঠিল।''[২৯] আবার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন— ''বাঙ্গালীর বিশিষ্ট মানসগঠন যখনই সর্বভারতীয় আদর্শ হইতে স্বাতন্ত্র্যে তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখনই দৈবশক্তিকে মাতৃরূপে পরিকল্পনা করা ইহার স্বভাবধর্ম হইয়া দাঁড়াইল। ... চণ্ডী এই স্বভাবধর্মের অনুকূল ও পরিপোষকরূপে শীঘ্রই বাঙালীর ধর্ম-সংস্কারের অঙ্গীভূত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ভয়ংকর রূপকে আচ্ছন্ন করিয়া তাঁহার দয়াময়ী অন্নপূর্ণামূর্তি প্রবল হইয়া

উঠিল। বিশেষত ভিখারী, ছন্নছাড়া, আত্মভোলা মহেশ্বরের গৃহিণী ও কার্তিক-গণেশের জননীরূপে তিনি বাঙ্গালী পরিবারের পালনীশক্তির আধার মাতার সঙ্গে অভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেন।''[৩০] মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা লক্ষ্য করি—

''ক্রোধে কালিকা জে মরায়ে দিল পাও।
বিকট দশন হৈল দশভূজা মাও।।
জিহ্বা হৈল লহ ২ মুখ ঘোরতর।
দেখিতে ২ ঐরি জায়ে যম ঘর।।''[৩১]

দেবীর এই প্রচণ্ড ধ্বংসকারিণী, সংহারকারিণী মূর্তি দেখে কালকেতু ও ফুল্লরা মূর্ছিত হলে—

''প্রাণ পুত্র বলিয়া তুলিআ লৈল কোলে।
শ্যামার কোলে কালকেতু পড়িল নিদ্রাভোলে।।''[৩২]

এরূপ স্বচ্ছন্দ, স্বস্তির আশঙ্কামুক্ত মাতৃরূপিনী দেবীর স্নেহের আশ্রয় কল্পনা করেছিল সমকালীন বঙ্গবাসী। তাই মনে হয়, সামাজিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শক্তিময়ী কালীকে বাঙালী চণ্ডী দেবীর সঙ্গে এক করে উপাসনা করতে শুরু করে। তাই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলিতে চণ্ডীর স্বরূপে কালীর শক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রসঙ্গত, নীহাররঞ্জন রায়-এর ভাষায় বলা যায়— ''শক্তিধর্মের দিকে বাঙালীর ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ। এ-তথ্য লক্ষণীয় যে, আদিপর্বের শেষের দিক্ হইতেই দুর্গা, কালী ও তারার প্রতিপত্তি বাড়িতেছিল, এবং এই তিন দেবীই যে শক্তির আধার, ঘনায়মান অন্ধকারে ইহারাই যে একমাত্র আশা ও ভরসা এ-বিশ্বাস যেন ক্রমশ বাঙালীচিত্তকে অধিকার করিতেছিল। বস্তুত, এই সময় হইতেই বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাধনায় তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রাধান্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার মত যে, মুসলমানাধিকারের কিছুকাল পরই শক্তিসাধক বাঙালীর অন্যতম বেদ কালিকাপুরাণ রচিত হয় এবং শক্তিময়ী কালী বাঙালীর অন্যতম প্রধান উপাস্যা দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হন। ... বাঙালী ভয়-ভাবনার কিছুটা ঊর্ধ্বে উঠিতে, চিত্তে একটু সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। এই কালীই তাহার চণ্ডী, এবং সমস্ত মধ্যপর্বে চণ্ডীর প্রতাপ দুর্জয়!''[৩৩] তাই বলা যায়, বাঙালী সামাজিক অবস্থার সংকটে পড়ে দুটি পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতির সমন্বয়ে এবং শক্তিরূপিনী, অভয়দাত্রী, মাতৃরূপিনী আশায় মধ্যযুগে ষোড়শ শতাব্দীতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সৃষ্টি হয়। চণ্ডীমঙ্গল কাবের ধারাটি চৈতন্যত্তোর কালে সৃষ্টি হলেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই শাখাটি সাহিত্যের জগতে জীবিত ছিল। সেই ধারার আদি কবি মানিক দত্ত। তিনি ষোড়শ শতাব্দীর কবি। তাঁর সমসাময়িক ও কালানুক্রমিক আবির্ভূত কবিগণ হলেন মুকুন্দ চক্রবর্তী, দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দ, দ্বিজমাধব প্রমুখ। সপ্তদশ শতাব্দীতে দ্বিজরাম দেব ও দ্বিজ হরিরাম প্রভৃতি কবিরা চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এছাড়াও এই ধারা

অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন কবির কলমে জীবিত ছিল; তাঁরা হলেন রামানন্দ যতি, মুকুন্দরাম সেন, কৃষ্ণরাম দাস, জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, অকিঞ্চন চক্রবর্তী, জনার্দন প্রমুখ। মানিক দত্তের প্রায় সমসাময়িক 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য রচনার সমাপ্তি কাল সম্বন্ধে সুকুমার সেন তাঁর মুদ্রিত 'কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন— ''কাব্যরচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দের পরে নয়।''[৩৪] তিনি প্রথম চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীকে অত্যন্ত সুকৌশলে, কার্যকারণ সূত্রে ও ঘটনার সংক্ষিপ্ততায় নবরূপ দান করেন। নিজস্ব জীবনাভিজ্ঞতায় চরিত্রকে গড়ে তোলেন বাস্তব সম্মত ভাবে। তিনি মঙ্গলকাব্যের গতানুগতিক গঠনের মধ্যেও নিজস্ব শিল্পবোধে ও কুশলী মৌলিক প্রতিভায় 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য ধারায় সর্বশ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করে আছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী পর দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দ নামে একজন কবির উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর গ্রন্থের নাম 'বাসুলীমঙ্গল'। দ্বিজ তাঁর উপাধি তাঁর পিতামহের নাম দেবরাজ মিশ্র, পিতার নাম বিকর্ত্তন মিশ্র, মাতার নাম হারাবতী, সহোদরের নাম গদাধর মিশ্র ও তিন পুত্র রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন। তাঁদের বামস্থান বর্ধমান জেলার মঙ্গলঘাট পরগণায় আমুরিয়া গ্রামে। তাঁর কাব্যের রচনা কাল সম্বন্ধে ও তার যাবতীয় তথ্য তুলে ধরেছেন মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়। তিনি তাঁর 'বাসুলীমঙ্গল' কাব্যের রচনা কাল সম্বন্ধে বলেছেন— ''কবিচন্দ্র মুকুন্দের বাসুলীমঙ্গল হইতেই আসিয়া থাকে, তবে দেখা যাইতেছে যে, বাসুলীমঙ্গলের রচনা কাল ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ।''[৩৫] তিনি দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দ, কবিকঙ্কণ নন। দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দের পর দ্বিজমাধব 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যের নাম 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। তাঁর কাব্যের রচনাকালজ্ঞাপক চরণটি হল—

''ইন্দু-বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায়ে সারদা চরিত।।''[৩৬]

অর্থাৎ ইন্দু (১), বিন্দু (০), বাণ (৫), ধাতা (১) — 'অঙ্কস্যবামা গতিঃ' অনুসারে ১৫০১ শকাব্দ বা (১৫০১ + ৭৮) ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কাব্যটি রচনা হয়। তাঁর কাব্যটি তান্ত্রিক ধর্মের ছত্রছায়ায় লেখা। তার ফলে কাব্যের গঠন ও চরিত্রে তন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দ্বিজরামদেব দ্বিজ মাধবের অনুসারী কবি। তাঁর কাব্যের নাম 'অভয়ামঙ্গল'। কাব্যটির রচনাকাল সম্বন্ধে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন — ''তবে তাঁহার 'অভয়ামঙ্গল ১৬৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত' ...।''[৩৭] তিনি চট্টগ্রামের অধিবাসী এবং সেই অঞ্চলে প্রচলিত চণ্ডীপূজার ঐতিহ্য অনুসরণে কাব্যটি রচনা করেছিলেন। আর দ্বিজ হরিরাম সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের কবি। তিনি মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটালের অন্তর্গত চিতুয়া ও বরদাবাটী পরগণার অধিশ্বরের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তাঁর কাব্যে মুকুন্দ চক্রবর্তীর

সুস্পষ্ট প্রভাব বিদ্যমান। একই প্রভাবে রচিত রামানন্দ যতির চণ্ডীমঙ্গল কাব্যটি। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের কবি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকাল সম্বন্ধে যে কালজ্ঞাপক পংক্তি পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যের রচনার (১৭৫২) পর তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাই মনে হয়, দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের যে সকল ব্রতকথা লোকসমাজে প্রচলিত ছিল তা কবি মানিক দত্ত সর্বপ্রথম একত্রীভূত করে কাহিনীর রূপ দেন। কাজেই 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যধারার সূচক হিসাবে মানিক দত্তের একটা আলাদা মর্যাদা রয়েছে। সেই মানিক দত্তের কবি পরিচয় পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

তথ্যসূত্র :

১। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; বিদ্যাপতি ও জয়দেব, বঙ্কিম রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ১৩৬১, সংশোধিত দ্বাদশ মুদ্রণ, আশ্বিন, ১৪০১, পৃ. ১৬৭।

২। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ডঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম অরুণা সংস্করণ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ৩৭।

৩। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত), অক্‌টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৪৯।

৪। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ডঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম অরুণা সংস্করণ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ৪২।

৫। তদেব।

৬। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৫৩।

৭। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ১০।

৮। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ডঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম অরুণা সংস্করণ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ১৩২।

৯। তদেব; পৃ. ১৩৫।

১০। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ১০।

১১। তদেব।

১২। শশিভূষণ দাশগুপ্ত; বাঙলা সাহিত্যের পটভূমিরূপে কয়েকটি ধর্মসাধনা (বাঙলা-সাহিত্যে গুহ্য সাধনার

ধারা), মর্মানুবাদক, গোপীমোহন সিংহরায়, ভারবি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৪১৮, পৃ. ২২।

১৩। তদেব।

১৪। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৮০।

১৫। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত, অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩৮।

১৬। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম অরুণা সংস্করণ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ৪৩।

১৭। সুকুমার সেন; বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৯১, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর ২০০৭, পৃ. ৮০।

১৮। অরবিন্দ পোদ্দার; মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্ধিত, অক্টোবর, ১৯৫৮, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৯৯, পৃ. ৩৯-৪০।

১৯। তদেব; পৃ. ৩৯।

২০। মাইকেল মধুসূদন দত্ত; কাশীরাম দাস, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ১২৩।

২১। গোপাল হালদার; বাঙ্‌লা সাহিত্যের রূপ-রেখা, প্রথম খণ্ড : প্রাচীন ও মধ্যযুগ, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম অরুণা সংস্করণ, ১৪০১, চতুর্থ মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২, পৃ. ৪৪।

২২। সুকুমার সেন; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (? — ষোড়শ শতাব্দী), আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, নভেম্বর, ২০০৭, পৃ. ৭৮।

২৩। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪ পৃ. ২৩।

২৪। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৪, পৃ. ৫৪৯।

২৫। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত; দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ।

২৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, সাহিত্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী, অষ্টম খণ্ড, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ, ১৩৪৪, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ, ১৩৯৩, পৃ. ৪৪১-৪৪২।

২৭। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪ পৃ. ১৩০।

২৮। সুকুমার সেন সম্পাদিত, বৃন্দাবন দাস বিরচিত চৈতন্যভাগবত, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২, তৃতীয় মুদ্রণ, ২০০৩, পৃ. ২৪৫।

২৯। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; কবিকঙ্কণ চণ্ডী (প্রথম ভাগ), শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন সংস্করণ, আগষ্ট, ১৯৫২, পুনর্মুদ্রিত, ১৯৯৬, পৃ. ১৩-১৪।

৩০। তদেব; পৃ. ১৫।

৩১। সুনীলকুমার ওঝা সম্পাদিত; মানিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ, ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৮৪ পৃ. ১০৭।

৩২। তদেব; পৃ. ১০৮।

৩৩। নীহাররঞ্জন রায়; বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, মাঘ, ১৪১৪, পৃ. ৭২৩।

৩৪। সুকুমার সেন; কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৭, পৃ. ৪৩।

৩৫। আশুতোষ ভট্টাচার্য; চণ্ডীমঙ্গলের আরও দুই জন কবি, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পত্রিকাধ্যক্ষ শৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ও ত্রিদিবনাথ রায়, ৬০ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩।

৩৬। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; দ্বিজমাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬৫, পৃ. ।

৩৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ, দ্বাদশ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৪৩৯।

——oo——